



ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 467-474

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.034

বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে - পার্বত্য ত্রিপুরা

ড. খেলন দাস হালদার, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, আগরতলা, ত্রিপুরা

Abstract

For centuries now, Bengali language and literature has flourished in Tripura and has become an integral part of it's society and cultural identity. During monarchy, from around 5th-6th century AD the influx of Bengali speaking people began in Tripura which has had a profound impact on the Kingdom of Tripura, it's Royal family and also on it's literature and culture.

In 14th century AD, Maharaja Ratna Manikya settled a large population of Bengalis from Bengal Province into Tripura with the assent of Bengal's then ruler. Alongwith the spread of Bengali language, from 15th century AD onwards Bengali literature also started to flourish in Tripura.

In late 15th century AD, on the instructions of Maharaja Dhanya Manikya, Chantai Durlabhendra and poets Baneshwar and Shukreshwar compiled a chronicle of the Kings of Tripura, known as Rajmala(Pratham Lahar), which is considered to be one of the oldest examples of Bengali literature and composition. Thus, during the time Boro Chandidas's "Shree Krishna Kirtan" Kabya, Krittibas's "Shree Ram Panchali" Kabya & Chandidas and Bidyapati's "Baishnab Padabali" were being composed in Bengal, a historical chronicle of the Kings of Tripura in Bengali was written in Tripura. Between 15th & 18th century, three more Lahar(parts) were subsequently added to it.

Since Medieval times till the recent years, the Kings of Tripura have supported and encouraged Bengali language and literature, including translation of Sanskrit Purana into Bengali, Vaishnab Padabali, poetry and prose and other forms of Bengali literature, with some of these even created by members of the Tripura Royal family.

In the 20th century, post India's independence, monarchy come to an end in Tripura, with it being integrated into India and a democratic system of government was established here. Since then, Bengali language and literature has developed immensely in the state. At present, the Bengali literary community of Tripura through their writing, research & craft has been contributing greatly to the enrichment of the already vast and rich Bengali literary repository.

Outside Bengal, the tiny north-eastern state of Tripura has made significant contributions to the enrichment, growth and development of Bengali language and

literature. It's literary community has left a lasting and ever evolving impression on Bengali literature.

Keyword: Tripura, Rajmala, Maharaja Dhanya Manikya, Vaishnav Padabali, Medieval Bengali Poetry, Bengali Literary History

বহির্বঙ্গে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে বঙ্গ সংলগ্ন ত্রিপুরার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বহু প্রাচীন কাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্য বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার সংস্রবে এসেছে এবং রাজন্য যুগে ত্রিপুরেশ্বরগণের বিশেষ আগ্রহ ও প্রয়াসে বাঙালি প্রজা সমাবেশ ঘটেছে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছে।

প্রাচীনকালে ত্রিপুরা ছিল রাজন্য শাসিত। তবে ত্রিপুরার রাজবংশ প্রতিষ্ঠা তথা আর্থ উপনিবেশ গড়ে উঠার আগে তা ছিল পার্বত্য ভোটচিনীয়া গোষ্ঠীর অন্তর্গত কিরাত^১ জাতি অধ্যুষিত কিরাত দেশ। ত্রিপুরার রাজবংশের প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থ ‘শ্রীরাজরত্নাকরম’ অনুসারে সুপ্রাচীন কালে, পৌরাণিক যুগের কোন এক সময় গঙ্গাসাগরস্থিত ত্রিবেণী রাজ্যে অধিষ্ঠিত দ্রুহ্য^২ বংশীয় রাজা প্রতর্দন কর্তৃক কিরাত দেশ জয় ও উত্তর কাছাড় আদি রাজ্যের নামানুসারে কিরাতদেশে নতুন ‘ত্রিবেণী’ নামক রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

“চতুর্দশদিনান্তে তু ঘোরে সাংখ্যে প্রতর্দনঃ। বিজিগ্যে বহুকষ্টেন কিরাতিধিপতি নৃপ।।”^৩

অর্থাৎ চৌদ্দদিনের ঘোরতর যুদ্ধে প্রতর্দন বহুকষ্টে কিরাতিধিপতিকে পরাজিত করেছিলেন। বেশ কয়েক পুরুষ পর প্রতর্দন প্রতিষ্ঠিত দ্রুহ্য বংশে ত্রিপুর নামক প্রতাপশালী রাজার আবির্ভাব ঘটে এবং পরবর্তী কালে তাঁর নামানুসারে রাজ্যটি ত্রিপুর রাজ্য ও রাজবংশটি ত্রিপুর বংশ নামে অভিহিত হয়।

“দ্রুহ্য বংশে দৈত্য রাজা কিরাত নগর। অনেক সহস্রবর্ষ হইল অমর।।

বহুকাল পরয়ে তান পুত্র উপজিল। ত্রিবেণীতে জন্ম নাম ত্রিপুর রাখিল।।”^৪

ত্রিপুর পুত্র ত্রিলোচন মহাভারতীয় যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক বলে ‘রাজমালা’র দাবি। ত্রিপুর রাজার কয়েক পুরুষ পরবর্তী মহারাজ দাক্ষিণ-এর রাজত্বকালে উত্তর কাছাড় থেকে দক্ষিণ কাছাড়ের তথা বরাক উপত্যকার খলজায়^৫ ত্রিপুরার রাজপাট স্থানান্তরিত হয়। দক্ষিণ কাছাড় অঞ্চলটি বঙ্গদেশের শ্রীহট্ট সংলগ্ন। একটা সময় শ্রীহট্টেরও অনেকাংশ ত্রিপুর-রাজের অধিকারে এসেছিল, এমনকি ত্রিপুরার রাজপাটও একসময়, আনুমানিক খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে, মহারাজ প্রতীতের রাজত্ব কাল থেকে তৎকালীন শ্রীহট্টের অন্তর্গত ধর্মনগর, কৈলাসহর ইত্যাদি স্থানে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং দীর্ঘকাল তথায় অবস্থিত ছিল। এপ্রসঙ্গে ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে লেখক উল্লেখ করেছেন,

“ত্রৈপুর রাজগণের রাজধানী বহুকাল কৈলারগড়ে ছিল বলিয়া ইহা এক সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হইয়াছিল। কৈলারগড় বহুকাল হইতেই শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে শ্রীহট্টের দক্ষিণাংশ ত্রৈপুর রাজহট্টের ছায়াতলে অবস্থিত ছিল।”^৬

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত কৈলাসহরে তথা উত্তর ত্রিপুরায় রাজপাট অবস্থিত ছিল বলে জানা যায়। ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’ গ্রন্থে লেখক অচ্যুত চরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি বলেছেন জানিয়েছেন যে গিয়াস-উদ্দীনের সময় (খ্রিষ্টীয় ১২১২ অব্দ) শ্রীহট্টের পুণ্যভূমি প্রথম মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, সেই সময় কৈলারগড়ও আক্রান্ত হয়েছিল এবং মহারাজ কীর্তিধর শ্রীহট্টের সমতল ক্ষেত্রে অতঃপর রাজধানী রাখা নিরাপদ মনে করেন নাই। তখন রাজধানী কৈলাসহর থেকে কসবায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। লেখক আরও জানিয়েছেন,

“কসবা শ্রীহট্ট জিলাধীন নহে, সুতরাং কীর্তিধরের রাজত্বকাল পর্যন্তই শ্রীহট্টের ইতিহাসের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ।”^৪

ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে ত্রিপুরার রাজপাট রাঙামাটি তথা দক্ষিণ ত্রিপুরার উদয়পুর স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়, ক্রমশ মেহেরকুল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ইত্যাদি অঞ্চল ত্রিপুরার অধিকারে আসে এবং অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজপাট উদয়পুর অবস্থিত থাকে। অতঃপর পুরাতন আগরতলা এবং সর্বশেষে আগরতলায় রাজপাট স্থানান্তরিত হয়।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক থেকে ত্রয়োদশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত প্রায় সাত শত বৎসরের বেশি সময় ধরে ত্রিপুরার রাজপাট শ্রীহট্ট অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, আর শ্রীহট্ট ছিল বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত বাঙালি অধ্যুষিত একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। বৃহত্তর বঙ্গের অন্তর্গত শ্রীহট্টেও বঙ্গদেশের পাশাপাশি একই সময় বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে সমৃদ্ধ ও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। তৎকালীন বঙ্গদেশের সীমান্ত রাজ্য সমূহে এই বঙ্গ ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। ধারণা করা যায় শ্রীহট্টের সূত্রে সুদীর্ঘ কাল ধরে বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার সান্নিধ্যে থাকার ফলে ত্রিপুরার রাজপরিবারের ভাষা ও সংস্কৃতিতে এই ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়েছিল। এই প্রসঙ্গে ‘রাজমালা’য় বঙ্গ নামে এক রাজার আমলে সর্বপ্রথম বাঙালি প্রজা স্থাপনের সংকেত রয়েছে, যিনি আনুমানিক পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে কোন এক সময় বর্তমান ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন মহারাজা যশ -

“তান পুত্র হইলেক বঙ্গ মহারাজা // আপনার নামে রাজা স্থাপিলেক প্রজা।”^৫

মহারাজ বঙ্গ আপনার নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বঙ্গ জাতি তথা বাঙালি জাতির প্রজা স্থাপন করেছিলেন, এই কথা এখানে প্রকাশিত। মহারাজার বঙ্গ নামকরণের মধ্যেও বঙ্গদেশ ও বঙ্গ ভাষার সাহচর্যের ইঙ্গিত রয়েছে এবং সেই সাহচর্য শ্রীহট্টের মাধ্যমে ঘটেছিল বলে অনুমান করা যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীতে রত্ন মাণিক্যের শাসনামলে, রাজার প্রয়াসে ত্রিপুরায় বিশেষ ভাবে বাঙালি উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। ‘শ্রীরাজমালা’ অনুসারে রত্ন মাণিক্য গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের শাসনামলে (১৩৪৫-১৩৫৭ খ্রিঃ), তাঁর সৈন্য সহায়তায় ভ্রাতাদের বিতাড়িত করে রাজ্যলাভ করেছিলেন চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে। রাজ্য লাভের পর কৃতজ্ঞতা জানাতে বহু হস্তী উপঢৌকন রূপে নিয়ে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। রত্ন মাণিক্য রাজ্য পরিচালনায় প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছিলেন। রাজ্যলাভের পূর্বে চার বৎসর গৌড়ে বসবাস কালে সেখানকার উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। ত্রিপুরায় বঙ্গের অনুরূপ প্রশাসন ব্যবস্থা প্রচলন ও পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে রত্ন মাণিক্য গৌড়েশ্বরের নিকট বাঙালি প্রজা প্রাপ্তির অনুরোধ করেছিলেন -

“গৌড়েশ্বর স্থানে পুনঃ কহিলেক আর।/বঙ্গলোক কত পাইলে রাজ্যেতে নিবার।।

পুনঃ দশ হস্তী দিল গৌড়েশ্বর তরে।/তুষ্ট হইয়া আজ্ঞা দিল বঙ্গ অধিকারে।।”^৬

‘ত্রিপুরার জন্য গৌড়েশ্বরের নিকট বঙ্গলোক’ অর্থাৎ বাঙালি লোকজন প্রাপ্তির অনুরোধ রেখেছিলেন রত্ন মাণিক্য, কারণ বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্মদক্ষতা, ভাষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালি জাতি যে অগ্রগণ্য, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বঙ্গে বসবাস কালে। রত্ন মাণিক্যের প্রতি ছিল গৌড়েশ্বরের স্নেহ দৃষ্টি। অতএব প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিলো -

“পরয়ানা করি দিল বার বাঙ্গালাতে।/ নবসেনা যতেক মিলানি করি দিতে।।

দশ হাজার ঘর বঙ্গ দিতে আঙা হৈল।/ বঙ্গে আসি সেনা চারি হাজার পাইল।।

ভদ্রলোক প্রভৃতি যতেক নবসেনা।/ স্বর্ণগ্রামে পাইল শ্রীকর্ণ কতজনা।।”^৭

গৌড়েশ্বর পরয়ানা তথা আদেশপত্র করে দিলেন বার বাঙ্গালাতে। বার বাঙ্গালা বলতে বোঝানো হয়েছে বার ভূঁইয়ার শাসনাধীন বঙ্গদেশ। এককালে দ্বাদশজন ভৌমিক বা জমিদার কর্তৃক বঙ্গদেশ শাসিত হতো। মুসলমান নবাব বা সম্রাটগণ তাঁদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করতেন।

‘নবসেনা’ বলতে বোঝানো হয়েছে নবশাক জাতি, যেমন - গোপ, মালাকার, তিলি, তাঁতি, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, কৰ্ম্মকার, নাপিত ইত্যাদি নবসেনা মধ্যে গণ্য। শ্রীকর্ণ বা শ্রীকরণ কায়স্থ জাতির শাখা বিশেষ। লিপির ব্যবসায়ী বলে তারা এই রূপ আখ্যা পেয়েছে। ‘শ্রীরাজমালা’ অনুসারে ত্রিপুরায় রত্নমাণিক্যের রাজত্ব কালের বহু আগে থেকেই বাঙালি বসতি স্থাপিত হয়ে থাকলেও, পেশাভিত্তিক নানা জাতির বাঙালি বসতির সূচনা রত্ন মাণিক্যের রাজত্ব কালে শুরু হয়েছিল। রত্ন মাণিক্য চার বৎসর লক্ষণাবতীতে অবস্থান কালে তিন জন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী, বৈদ্য বংশোদ্ভূত, ধন্বন্তরী গোত্রজ জয়নারায়ণ সেন; অপর দুই জন কায়স্থ জাতীয়। তাঁদের মধ্যে একজনের নাম বড়খাণ্ডব ঘোষ, অপরজনের নাম পণ্ডিতরাজ। রত্ন মাণিক্য সিংহাসন লাভ করার পর এই তিনজনকে বিশেষ প্রস্তাব দ্বারা ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন এবং তাদের সহায়তায় গৌড়ের মুসলমান শাসনের অনুকরণে রাজ্যের শাসন প্রণালী প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁরা ত্রিপুরেশ্বরের অত্যন্ত বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে ‘বিশ্বাস উপাধি লাভ করেছিলেন। প্রশাসনিক দপ্তর থেকে শুরু করে নানা রকম শিল্প দ্রব্য ও জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র উৎপাদনে, কৃষি ও মৎস্য চাষে বাঙালি প্রজারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছিল। কিরাত জাতি অধ্যুষিত, পার্বত্য, জঙ্গলাকীর্ণ একটি অনুন্নত রাজ্যকে সুসংস্কৃত, সভ্য, উন্নত রাজ্যে পরিণত করার লক্ষ্যে সেই চতুর্দশ শতকে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাতশত বৎসর পূর্বে রত্ন মাণিক্য গৌড়েশ্বরের নিকট রীতিমতো আবেদন জানিয়ে ত্রিপুরায় বিশাল সংখ্যক বাঙালি জাতি আনিয়েছিলেন এবং রাঙ্গামাটি সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন।

”সর্বজন মিলিলেক আর মিলে কুঁকি।/ প্রজা লোক সুখে বসে নাহি কেহ দুঃখী।।”^৮

বাঙালি জাতি ও জনজাতির সম্মিলিত ধারা ত্রিপুরায় প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি স্বাভাবিক গতিতে বয়ে চলেছে। বাঙালি জাতির সংস্রবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব পড়েছে ত্রিপুর রাজ পরিবার ও রাজ্যের উপর। বাংলা ভাষা চর্চা ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রাচীন কাল থেকেই ছিলেন যত্নশীল। যার ফলে পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে মহারাজ ধর্ম মাণিক্যের রাজত্ব কালে(১৪৩১-১৪৬১ খ্রিঃ), মহারাজের অনুজ্ঞায় বাংলা ভাষায় রাজবংশের ইতিহাস ‘শ্রীরাজমালা’র প্রথম লহর রচিত হয়। ধর্ম মাণিক্যের আদেশে চন্ডাই^৯ দুর্লভেন্দ্র এবং বানেশ্বর ও শুক্রেস্বর নামক রাজার সভাকবিদ্বয়(শ্রীহট্টের অধিবাসী) ‘রাজমালা’ প্রথম লহর রচনা করেছিলেন। রাজমালা রচনা কালে দুর্লভেন্দ্র বেদব্যাসের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং গণেশরূপী শুক্রেস্বর ও বাণেশ্বর, দুর্লভেন্দ্রর উক্তি বাংলা ভাষায় কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় ইতিহাস ভিত্তিক কাব্য গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, বাংলা ভাষার জন্য তা কম গৌরবের বিষয় নয়। যখন বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষায় বড় চণ্ডীদাসের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্য, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, কৃষ্ণিবাস ওঝার অনুবাদ গ্রন্থ ‘শ্রীরাম পাঁচালি’

ইত্যাদি জনপ্রিয় সাহিত্য রচিত হচ্ছিল, ঠিক সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলা ভাষায় ‘শ্রীরাজমালা’ নামক অসাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ কাব্যাকারে রচিত হয়েছিল। বঙ্গদেশের বাইরে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার এই অবদান অবিস্মরণীয়।

পরবর্তী কালে মহারাজ ধন্য মাণিক্য(১৪৯০-১৫১৫খ্রিঃ) পঞ্চদশ শতকের অন্তিম পর্বে বঙ্গ ভাষায় ‘উৎকল খণ্ড পাঁচালী’ এবং ‘যাত্রা রত্নাকরনিধি’ নামক গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। মহারাজ ধন্য মাণিক্য রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যাপারে বাংলা ভাষার ব্যবহার প্রচলন করেছিলেন যা অদ্যাবধি প্রচলিত। মহারাজা অমর মাণিক্যের রাজত্ব কালে(১৫৭৭ খ্রিঃ -১৫৯১ খ্রিঃ), তাঁর আদেশমতে সেনাপতি রণচতুরনারায়ণের সহায়তায় ‘রাজমালা’র দ্বিতীয় লহর রচিত হয়।

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ও তৎপুত্র মহারাজ রামদেব মাণিক্যের অনুজ্ঞায় রাজপুরোহিত ও সভাপণ্ডিত গঙ্গাধর সিদ্ধান্তবাগীশ কর্তৃক খৃঃ সপ্তদশ শতকে ‘রাজমালা’র তৃতীয় লহর রচিত হয়েছে। খ্রিষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্যের অনুজ্ঞায় ‘রাজমালা’র চতুর্থ লহর রচিত হয়। চতুর্থ লহরের বক্তা জয়দেব ঠাকুর, রচয়িতা বক্তার পুত্র দুর্গামণি ঠাকুর। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে ‘শ্রীরাজমালা’র চারটি লহর বা খণ্ড বাংলা ভাষায় রচিত হয়। বঙ্গ ভাষায় ‘রাজমালা’ রচনার মাধ্যমে বঙ্গদেশের বাইরে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস রচনা করেছে ত্রিপুরা। প্রাচীন কাল থেকেই ত্রিপুরার রাজাগণ যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব থেকে ধারাবাহিকভাবে রচিত এই ‘রাজমালা’ গ্রন্থ।

ত্রিপুরার পাশাপাশি আরাকান, চট্টগ্রাম, কাছাড়, জয়ন্তীয়া, কোচবিহার ইত্যাদি প্রান্তীয় রাজ্য সমূহে রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য রচনার সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। আরাকানের রোসাঙ্গ রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যযুগের(সপ্তদশ শতক) বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে দৌলত কাজীর ‘লোর চন্দ্রানী বা সতী ময়না’, সৈয়দ আলাওলের ‘পদ্মাবতী’। চট্টগ্রামের সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বর রচিত (ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে) অনুবাদ কাব্য ‘পরাগলী মহাভারত’, ‘ছুটিখানী মহাভারত’। কাছাড়ের ডিমাছা রাজমাতা চন্দ্রপ্রভা দেবী অষ্টাদশ শতকে বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন ‘বৃহন্নারদীয় পুরাণ’। ডিমাছা রাজ্যের রাজাগণ বাংলা ভাষায় কাব্য রচনা করেছেন। বাংলায় রচিত হয়েছে ডিমাছা রাজ্যের দণ্ডবিধি। প্রাচীন জয়ন্তীয়া রাজ্যেও একসময় বাংলা ছিল রাজভাষা। সেখানেও রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যের চর্চা হয়েছে। জয়ন্তীয়ার শেষ রাজা রাজেন্দ্র সিং নিজেও একজন বৈষ্ণব কবি ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের উদার পৃষ্ঠপোষকতা হয়েছে কোচবিহার রাজসভাতেও। ষোড়শ শতকে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণ অহোম রাজা চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে যে পত্র লিখেছিলেন - তা প্রাচীনতম বাংলা গদ্য রচনার প্রথম প্রামাণ্য দলিল হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের এইসব বঙ্গদেশের প্রান্তীয় রাজ্যে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার ভূমিকা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে পরিচিত ‘শ্রীরাজমালা’ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে ধারাবাহিক ভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার সমৃদ্ধ ইতিহাস। ১৯২৬ সালে প্রকাশিত ‘ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস ‘ গ্রন্থে শীতল চক্রবর্তী ‘রাজমালা’ প্রসঙ্গে বলেছেন -

“ইহা বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত এবং বঙ্গসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ। ইহা চৈতন্য চরিতামৃত’ ও কৃষ্ণিবাসের ‘রামায়ণে’র পূর্ববর্তী।”^৩

অতএব লক্ষ্য করা যায়, মধ্যযুগের পঞ্চদশ শতক থেকে বঙ্গদেশের প্রান্তীয় রাজ্য ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা মর্যাদার সঙ্গে সাহিত্য চর্চায় ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

‘রাজমালা’ ব্যতীত আরও প্রচুর গ্রন্থ প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান যুগে ত্রিপুরায় বাংলা ভাষায় রচিত হয়ে চলেছে। ত্রিপুরার মহারাজা ধন্য মাণিক্য(১৪৯০-১৫২৯খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় ‘উৎকল খণ্ড পাঁচালী’ ও ‘যাত্রা রত্নাকরনিধি’ নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন। ত্রিপুরার রাজাদের মধ্যে কল্যাণ মাণিক্য(১৬২৬-১৬৬০খ্রিঃ) প্রথম বাংলা ভাষায় তাম্রশাসন প্রদান করেছিলেন। মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য(১৬৬০-১৬৭৩খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন ‘বৃহন্নারদীয় পুরাণ’। মহারাজা দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যের রাজত্ব কালে(১৬৮৫-১৭১২খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে ‘চম্পক বিজয়’ নামক একটি সুন্দর ঐতিহাসিক কাব্য। জগৎ মাণিক্য ১৭২৬ খ্রিষ্টাব্দে অনুবাদ করিয়েছিলেন পদ্মপুরাণের অন্তর্গত ‘ক্রিয়াযোগসার’ গ্রন্থ।

রাজধর মাণিক্যের রাজত্ব কালে(১৭৮৫-১৮০৬খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্যের(১৭৬০-১৭৮৩ খ্রিঃ) সংঘাতময় জীবন ও বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে ‘কৃষ্ণমালা’ নামক একটি ঐতিহাসিক কাব্য। মহারাজা কাশীচন্দ্র মাণিক্যের রাজত্ব কালে ১৮২৬-১৮২৯খ্রিঃ) বাংলা ভাষায় রচিত অপর একটি ঐতিহাসিক কাব্য ‘শ্রেণীমালা’।

কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৮২৯-১৮৪৯খ্রিঃ), মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় সমগ্র রাজমালাকে সংশোধিত ও পরিমার্জিত করে সংকলন করেছিলেন দুর্গামণি উজির।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য(১৮৬২-১৮৯৬খ্রিঃ) রাজ্যে বাংলা ভাষার ব্যবহার অবশ্য প্রয়োজনীয় করে তুলেছিলেন। তাঁর রাজত্ব কালে রাজকীয় আইন কানুন বাংলা ভাষায় লিখিত রূপে প্রচারের সূচনা ঘটে এবং ত্রিপুরার সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের সূচনা হয় বীরচন্দ্রের আমল থেকেই। ‘ভগ্নহৃদয়’ কাব্য পাঠ করে কিশোর কবির মধ্যে ভুবনজয়ী কবি প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলেন প্রথম বীরচন্দ্র মাণিক্য। তিনি নিজেও ছিলেন একজন বৈষ্ণব কবি। তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ‘হোরি’, ‘ঝুলন’, ‘প্রেম মরিচিকা’, ‘উচ্ছ্বাস’, ‘অকাল কুসুম’, ‘সোহাগ’ ইত্যাদি। শ্রীমঙ্গলবত গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছেন তিনি। দীনেশ চন্দ্র সেন রচিত ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ গ্রন্থটি মহারাজার অর্থানুকুল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। মহারাজ বীরচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ কন্যা রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবীর কবি প্রতিভা ছিল অসাধারণ। তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থ গুলোর মধ্যে রয়েছে ‘কণিকা’, ‘শোকগাথা’, ও ‘প্ৰীতি’।

রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্ব কালে (১৮৯৬-১৯০৯খ্রিঃ) সরকারি মুখপত্র রূপে বাংলা ভাষায় ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ‘ত্রিপুরা স্টেট গেজেট’। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের রাজত্ব কালে(১৯০৯-১৯২০খ্রিঃ) বাংলা ভাষা রাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তদানীন্তন মন্ত্রী বাহাদুর মহারাজ কুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর অফিস আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে একটি সার্কুলারে স্পষ্ট লিখেছেন –“সর্ববিধ রাজকার্যে বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ এবং তদুপলক্ষ্যে ভাষার উৎকর্ষ বিধান করা শ্রীশ্রী যুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের একান্ত অভিপ্রেত।”(রাজ্য ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা, পান্না লাল রায়)। বীরচন্দ্র মাণিক্যের পুত্র বড় ঠাকুর সমরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাও একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। তিনি ‘ভারতীয় স্মৃতি’, ‘ত্রিপুরার স্মৃতি’ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করেছেন। রাজ আমলের অপর একজন খ্যাতিমান লেখক কর্ণেল মহিম ঠাকুর। বীরচন্দ্র

এবং রাধা কিশোর - দুই আমলে তিনি রাজ সরকারের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর রচিত ‘দেশীয় রাজ্য’ একটি বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থ। এর ভাষা ভঙ্গিমা ও রচনা শৈলী অত্যন্ত উন্নত মানের।

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য(১৯২৩-১৯৪৭খ্রিঃ) পূর্বতন রাজাদের মতোই বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নিজে একজন কবি, নাট্যকার ও সঙ্গীতকার ছিলেন। তিনি একটি ঐতিহাসিক নাটক ‘জয়াবতী’ এবং হোলি বিষয়ক একটি সংগীত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি ‘ভারতভাষ্কর’ উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। বীরচন্দ্র থেকে বীরবিক্রম - চার জন মাণিক্য রাজার সঙ্গে দীর্ঘ কাল ব্যাপী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয়তার সম্পর্ক ছিল, যার ভিত্তি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবন প্রভাতে কবি হিসেবে প্রথম সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য থেকে, আবার জীবন সায়াহ্নে শেষ সম্মান লাভ করেছিলেন বীরবিক্রম মাণিক্যের কাছ থেকে। ত্রিপুরায় জন্য তা পরম গৌরবের বিষয়।

ব্রিটিশ যুগে ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের কর্তৃত্ব ব্রিটিশের হস্তগত হয়। ক্রমশঃ সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরায় সরকারি কাজে ইংরেজি ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। মহারাজগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, নিতান্ত প্রয়োজন স্থল ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ইংরেজি ভাষার গতিরোধ করতে। কিন্তু ক্রমশঃ তা অপপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে এবং ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির পর থেকে বর্তমান কালে ক্রমশঃ ইংরেজির ব্যবহার বাড়তে থাকে। প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সর্বত্র ইংরেজির প্রবল প্রতাপ। বাংলা ভাষার ব্যবহারও চলছে, ক্ষীণ ধারায়। সুখের বিষয় হলো স্থানীয় ককবরক ভাষাও সরকারি কাজের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে এবং পত্র পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি মাধ্যমে বাংলা ভাষা ত্রিপুরায় এখনো সাদরে ব্যবহৃত হচ্ছে। হাল আমলে ত্রিপুরার প্রাবন্ধিক, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার প্রমুখের সংখ্যা এবং কৃতিত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মূল কথা হলো প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ত্রিপুরার আত্মিক সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে এবং উত্তরোত্তর ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হচ্ছে। ত্রিপুরায় আবহমান কাল ধরে প্রচলিত এই বাংলায় পূর্ব বঙ্গীয় ভাষা ভঙ্গি নয়, পশ্চিম বঙ্গীয়ও নয়, ত্রিপুরার নিজস্ব এক বাংলা ভাষা ভঙ্গি গড়ে উঠেছে যা এখানকার মাটি, জল, হাওয়ায় পরিপুষ্ট হয়েছে, বিকশিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অন্ধ অনুকরণ, অনুসরণে ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্য রচিত হয় না। সুদীর্ঘ কালের সাধনায় ত্রিপুরায় বাংলা সাহিত্যের এক নিজস্ব ভাষারূপ ও শৈলী গড়ে উঠেছে, যার মাধ্যমে উত্তর পূর্ব ভারতের এই ছোট্ট রাজ্যটি বহির্বঙ্গে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য চর্চার এক সমৃদ্ধ ইতিহাস রচনা করেছে।

বিষয় সূচক/মুখ্য শব্দ:

- ১। কিরাত; প্রাচীন কালে হিমালয়ের পূর্বভাগস্থ স্থান এবং বর্তমান ভূটান, আসামের পূর্বাংশ, মণিপুর, ত্রিপুরা, ব্রহ্মদেশ, এবং চীন সমুদ্রের তীরবর্তী কক্সোজ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে বসবাসকারী চীনা-তিব্বতীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত আদিম পার্বত্য জাতির নাম কিরাত।
- ২। দ্রুহ্য; তিনি প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত রাজা যযাতির পুত্র। রাজা যযাতি শুক্রাচার্যের অভিষেপে জরাগ্রস্ত হয়ে নিজ পুত্রদের নিকট জরাভার গ্রহণ করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ব্যতীত অন্য চার পুত্র তাতে অসম্মত হওয়ায় তিনি তাদের আর্ষাবর্তের বাইরে বর্বর অনার্য অধ্যুষিত অঞ্চলে নির্বাসিত করেছিলেন। দ্রুহ্য দুর্গম, সাগরজল বেষ্টিত, সুন্দরবন অঞ্চলে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ আর্ষাবর্তের বাইরে আর্ষ প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই জাতীয় নির্বাসন পরিকল্পিত হয়েছিল, যার সূত্র ধরে প্রাচীন কালে কিরাত দেশের মতো দুর্গম, জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলেও আর্ষ শাসন প্রবর্তিত হয়েছিল।
- ৩। খলংমা; এককালে বরাক উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ত্রিপুরার রাজধানী। বরবক্র নদীর অংশ বিশেষকে ত্রিপুরগণ খলংমা নামে অভিহিত করেছিল। সেই নদীর তীরবর্তী অঞ্চলকেও বলা হতো খলংমা।
- ৪। চন্তাই; ত্রিপুর রাজবংশের কুলদেবতা হলো চৌদ্দদেবতা। চৌদ্দদেবতা মন্দিরের প্রধান পুরোহিতকে বলা হয়ে থাকে চন্তাই। চন্তাইর মূল কাজ পূজার্চনা হলেও প্রাচীন কালে তাদের একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল রাজবংশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ রাখা এবং প্রয়োজনে তা বিবৃত করা। পঞ্চদশ শতকে মহারাজ ধর্মমাণিক্যের নির্দেশে চন্তাই দুর্লভেন্দ্র রাজবংশের ইতিহাস বিবৃত করেছেন এবং কবি শুক্রেস্বর ও বানেশ্বর বাংলা ভাষায় ‘রাজমালা’ নামে তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র:

- ১। ‘শ্রীরাজরত্নাকরম’ (পূর্ববিভাগ), দ্বাদশ সর্গ, জ্যোতিষ নাথ সম্পাদিত, ত্রিপুরা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৩, আগরতলা, পৃ; ১৭৯।
- ২। ‘শ্রীরাজমালা’, প্রথম লহর, শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ; ৬।
- ৩, ‘শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত’, পূর্বাংশ, দ্বিতীয় ভাগ, চতুর্থ অধ্যায়, অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, উৎস প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৯, ঢাকা, পৃ; ১৮২।
- ৪। তদেব, পৃ; ২০১
- ৫। ‘শ্রীরাজমালা’, প্রথম লহর, শ্রী কালীপ্রসন্ন সেন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, উপজাতি গবেষণা ও সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা কর্তৃক প্রকাশিত, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ; ৪৪।
- ৬। তদেব, পৃ; ৬৭।
- ৭। তদেব, পৃ; ৬৮।
- ৮। তদেব, পৃ; ৬৯
- ৯। ‘ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস’, শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী প্রণীত, পূর্ণেন্দু গুপ্ত সম্পাদিত, নবচন্দনা প্রকাশনী, প্রথম নবচন্দনা সংস্করণ, ২০১৭, পৃ; ১৭।